রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' : অতিপ্রাকৃতের গল্প

সুব্রত রায়

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণি বিভাগ করতে গিয়ে সাধারণত যে কয়েকটি গল্পকে ভৌতিক, অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত রসের গল্প হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, তন্মধ্যে 'নিশীথে' গল্পটি অন্যতম একটি। গল্পটি রবীন্দ্রনাথের 'গল্পদশক' গল্প গ্রন্থে প্রথম স্থান পায়। অতঃপর গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান প্রাপ্ত হয়। এটি প্রকাশিত হয় মাঘ, ১৩০১ (১৮৯৫)-এর 'সাধনা' পত্রিকায়। যদিও বহুসমালোচক একে অতিপ্রাকৃত শ্রেণির গল্প বলতে নারাজ। তাঁদের ব্যাখ্যা সামান্য ভিন্নতর। সমালোচক কবিতা কর মনে করেন, "নিশীথে গল্পের মূল ভিত্তিই হল বিশ্বাস-অবিশ্বাস। এটি কোন ভৌতিক কাহিনী নয়, লেখক মানব জীবনের মধ্য দিয়েই অতিপ্রাকৃত রস সৃষ্টি করেছেন মাত্র।" (রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ; পৃ. ৬২)। একই সুরে সুর মিলিয়ে সমালোচক মীনাক্ষী সিংহ বলেন, "আসলে কোন অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত রহস্য সেখানে নেই। সবটাই দক্ষিণাচরণের মনের অপরাধের বোধ থেকে উৎসারিত অলৌকিক কল্পনা।" (গল্পগুচ্ছ ঃ জীবনের মেঘ ও রৌদ্র; পৃ. ১১০) অধ্যাপক তরুণ ঘোষ বলেন, "অতিপ্রাকৃত শব্দের তুলনায় অতীন্দ্রিয় রহস্যানুভূতিকে অধিক মাত্রায় সত্য বলে মানতে হয়।" (প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র ও ছোটগল্প; পৃ. ১৭৮) সমালোচক কিশলয় জানা মন্তব্য করেন, "এ-গল্প আদৌ অলৌকিক পদবাচ্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।" (প্রদ্যোত বিশ্বাস (সম্পা) রবীন্দ্রগল্পের আকর ও আকার; পৃ. ১২৩) এজাতীয় মতামতের ভিত্তিতে সমালোচকগণ যতোই তাঁদের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যান না কেন, পরিণতিতে এসে সকলেই কিন্তু একমত হতে বাধ্য হয়েছেন। তা হল, গল্পটি অবশ্যই অতিপ্রাকৃত রসেরই গল্প— তার ভিত্তি, উৎস, উৎপত্তিস্থল যাই হোক না কেন। নিছক ভূতের গল্প না হলেও তাতে যে অলৌকিক একটি বাতাবরণ ও ভৌতিক একটি পরিমণ্ডল রচনা করার সার্থক প্রয়াস রয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ যে অতিপ্রাকৃত জনিত ভয় ও আতঙ্ককে গল্পমধ্যে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার সঙ্গে পরিবেশন করতে পেরেছেন তাতে কারো সন্দেহ থাকে না। এ

প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রখ্যাত সমালোচক ও বিদগ্ধ রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ডঃ তপোব্রত ঘোষ কিন্তু এই গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথের 'অতিপ্রাকৃত' গল্পের তালিকাভুক্ত করে নিয়েই আলোচনা করেছেন এবং তিনি উল্লেখ করেছেন, "নিশীথে গল্পে আবার ফিরে এসেছে রবীন্দ্রনাথের 'অতিপ্রাকৃত' গল্পের পরিচিত শিল্পরূপ।" (ডঃ অশোক কুণ্ডু ও অধ্যাপক ডঃ নিশীথ মুখোপাধ্যায় (সম্পা) রবীন্দ্র ছোটগল্প ঃ গল্পগুচ্ছ, আলোচনার আলোকে; পৃ. ৯২) অতএব, অতিপ্রাকৃতের নিরিখে যে গল্পটিকে বিচার করা যেতে পারে তা এহেন মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

'নিশীথে' গল্পটি ১৩০১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচক মহলে সাড়া ফেলে দেয় রবীন্দ্র প্রতিভায় বিচ্ছুরিত দ্যুতিময় এই গল্পটি। গল্পটি প্রথম রবীন্দ্রনাথের 'গল্পদশক' গল্প গ্রন্থে স্থান পায় এবং পরে গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিভিন্ন সমালোচকের দ্বারা বহু পঠিত ও বহু চর্চিত হওয়ার পর দেখা যায়, এটি অবশ্যই গা ছম্ ছম্ করা একটি পরিবেশ মুখর গল্প যদিও এতে ভূতের অবস্থান নেই। তবু এটি অলৌকিকের আস্বাদে পূর্ণ ও অতিপ্রাকৃত রসসিক্ত। তাইতো প্রখ্যাত সাহিত্যবিদ ডঃ সুকুমার সেন এটিকে বলতে পারেন, "ভূত ছাড়া ভূতের গল্প"। (আমাদের ভূতের গল্প; বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৫৩ আষাঢ় ১৩৫৪, পৃ. ৩৯) বলাবাহুল্য, এ গল্পে অতিপ্রাকৃতের ব্যঞ্জনা নায়ক দক্ষিণাচরণেরই সৃষ্ট অভিজ্ঞতার রসে পুষ্ট। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করা নায়কের অবচেতন মনে জমে থাকা অপরাধবোধ ও পাপী মনের বিকার থেকে জাত যে আতঙ্ক, সেই আতঙ্ক গ্রস্ত মনেই তিনি প্রথমা পত্নীর অশীরীরী উপস্থিতি অনুভব করেন সর্বত্র, তা-ও আবার রাত্রিকালে। এর যে বর্ণময় বিন্যাস রবীন্দ্রনাথ অতিপ্রাকৃতের মোরকে তুলে ধরেছেন, তাতে ভূত না থেকেও ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের দক্ষতার পরিচয়টিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এক্ষেত্রে উল্লেখনীয় যে, প্রকৃতির যে অংশকে মানুষ আবিষ্কার করতে পারে না তা-ই অতিপ্রাকৃত। এক কথায়, অতিপ্রাকৃত বলতে আমরা তা-ই বুঝি যা বাস্তব বা প্রাকৃত জগতের বহির্ভূত ঘটনা। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে যা ঘটে না বা ঘটতে পারে না, সহজে যা চোখে পড়ে না, যার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে থাকি না, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে হলেও ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করে আমাদের জীবনে অনুপ্রবেশ করে অথচ এর রেশ আমরা কাটিয়ে উঠতেও পারি না--তাকেই আমরা অতিপ্রাকৃত বা ভৌতিক বলে নির্দেশ করি। বিচিত্র প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পেও অতিপ্রাকৃতের

আভাস পাওয়া যায়। এই সমস্ত গল্পে একটি আতঙ্ক ও সর্বক্ষণ বিরাজমান রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে--যা আমাদের ভয়চকিত করে তোলে। সাধারণ বাঙালি জীবনের সঙ্গে অতিপ্রাকৃতের মিলন ঘটানো ও গা ছম্ ছম্ করা পরিবেশের সংযোগ সাধন করা খুবই সহজসাধ্য। কেননা বাঙালির মানস লোকে কতগুলো বিশ্বাস ও অন্ধসংস্কার আজন্ম রোপিত ও প্রায়ই লালিত হয়ে থাকে--যা অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে অনুকূলই নয় বরং উপযোগী। ভূত প্রেতাদির বিশ্বাস, ভগবানের প্রতি আস্থা, তুকতাক, তাবিজ, ওঝা বৈদ্য ইত্যাদির ওপর বাঙালি সমাজের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। আবার অন্যদিকে, আমাদের দৈনন্দিন জীবন এতোই গতানুগতিক যে, তাতে সর্বাবস্থায় মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায়ের দ্বারা অতিপ্রাকৃতের বর্ণনা করা অসম্ভব। তাই রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জীবন পরিবেশের মধ্যেই তাঁর রচনাকে কেন্দ্রীভূত করেছেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অতিপ্রাকৃত রসের গল্প সৃষ্টিতে সার্থকতার দ্বার উন্মোচন করেছেন। তাঁর সার্থক শিল্পকর্মের নজির স্বরূপ উল্লেখিত 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা', 'কঙ্কাল' প্রভৃতি গল্পগুলিতে তিনি এক আশ্চর্য ভৌতিক পরিবেশ রচনায় সক্ষম হয়েছেন এবং এগুলি অতিপ্রাকৃত রসের গল্প হয়ে উঠেছে অবশ্যই।

বাস্তব জীবনের সঙ্গে অতিপ্রাকৃতের সমন্বয় সাধন আমরা ইংরেজ কবি কোলরিজের মধ্যে লক্ষ্য করি। কিন্তু কোলরিজ তাঁর অতিপ্রাকৃত জগতকে সৃষ্টি করেছেন বাস্তব জগতের দৈনন্দিনতা থেকে বহুদূরে অবস্থান করে এক নৈসর্গিক মোহময় স্বপ্নাচ্ছন্নতার মধ্যে। অথচ বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ এই বাস্তব জগতের গৃহাঙ্গনের মধ্যেই এক আশ্চর্য কুহকবলে অতিপ্রাকৃতকে আহ্বান করে এনেছেন তাঁর গল্পের অবয়বে। ভৌতিকের মনোবিজ্ঞান সম্মত যে ব্যাখ্যা--'The spot in the brain that will show it self out' মস্তিষ্ক বিকারের বাহ্য অভিব্যক্তি, তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে সম্পূর্ণভাবে অবলম্বন করেছেন।

'নিশীথে' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্প পর্যায়ের একটি অনবদ্য সংযোজন। গল্পটির অবতারণা করা হয়েছে নিশীথ কালে। গল্পটি দ্বিতীয়বার পরিণীত দক্ষিণাচরণ বাবুর প্রথমা পত্নীর প্রতি করা একটি অপরাধক্লিষ্ট মনের বিকার সম্বলিত গল্প। এর আখ্যানভাগটি আলোচনা করলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে এবং আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে উঠবে অতিপ্রাকৃতের রহস্যটি ঠিক কোথায় নিহিত রয়েছে।

গল্পের কথক ও কেন্দ্রীয় চরিত্র দক্ষিণাচরণ বাবু একজন জমিদার ছিলেন। তাঁর

প্রথমা স্ত্রী রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিলেন। পত্নী যখন বর্তমান ছিলেন তখন তিনি তাঁর সঙ্গে নানা মধুর বার্তালাপে ও আলাপ আলোচনায় রত থাকতেন এবং পত্নীকে যে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন আর ভালোবাসেন তা জাহির করতেই তৎপর ছিলেন। তাঁকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত, "তোমার ভালোবাসা আমি কোনো কালে ভুলিব না।" (গল্পগুচ্ছ--২য় খণ্ড, নিশীথে, পৃ. ২২৪) অথচ ইতিমধ্যে পত্নীর অসুস্থাবস্থায় হারান ডাক্তারের মেয়ে মনোরমার সঙ্গে একটি অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তাই প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরই তিনি মনোরমাকে বিয়ে করেন এবং পূর্ব পত্নীকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। বলাবাহুল্য, মনোরমার প্রতি দক্ষিণাচরণ বাবুর দুর্বলতার কথা উপলব্ধি করতে পেরে ও স্বামীর আচরণে এর আভাস পেয়ে প্রথমা পত্নী এক প্রকার স্বেচ্ছায়ই প্রাণ বিসর্জন করেন তথা আত্মহত্যার মাধ্যমে স্বামীকে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর হন। তাই ইচ্ছাকৃত খাবার ওষুধ না খেয়ে মালিশের বিষাক্ত তেল সেবনের মাধ্যমে নিজেকে শেষ করে দেন। কেননা মনোরমার সঙ্গে দক্ষিণাচরণ বাবুর সাক্ষাৎকারের পর থেকেই স্ত্রীর সাহচর্য তাঁর কাছে অসহ্যকর মনে হতে থাকে। এমনকি, স্ত্রী মারা গেলেই তিনি শান্তি পাবেন এরূপ একটি মনোভাব বা প্রতীতি তাঁর অন্তরে জাগ্রত হতে থাকে। গল্প কথক হিসাবে তিনি এহেন মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়েছেন এভাবে, "মরুভূমির মধ্যে আর একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্যন্ত তখন চোখের সামনে কুলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না। রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।" (নিশীথে, পৃ. ২২৬)--এই স্বীকারোক্তি জনিত আচরণও প্রথমা স্ত্রীর নজর এড়িয়ে যেতে পারেনি। সর্বোপরি, একদা অসুস্থ স্ত্রী-কে দেখার জন্য মনোরমা তাঁদের বাড়িতে আসে। অপরিচিতা স্ত্রী লোক দেখতে পেয়ে প্রথমা পত্নী অত্যন্ত ভীত ও চকিত হয়ে ওঠেন এবং চমকে স্বামীর হাত ধরে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা সূচক একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন, "ওকে। ওকে গো।" (নিশীথে, পৃ. ২২৭) বার তিন এই প্রশ্ন করার পর দক্ষিণাচরণ বাবু প্রথমত বলে ওঠেন যে তিনি তাকে চেনেন না এবং পরমুহূর্তেই স্বীকার করেন যে, "ওঃ আমাদের ডাক্তার বাবুর কন্যা।" (নিশীথে, পৃ. ২২৭) তিনি তাঁর পতিগতপ্রাণা স্ত্রীকে মিথ্যা কথা বলে একটি সামান্য অভিনয়ের ভূমিকা পালন করেন বটে, কিন্তু তা তাঁর পত্নী অতি সহজেই অনুধাবন করে নিতে পারেন এবং জীবন শেষ করার জন্য আত্মহননের পথ বেছে নেন। স্বামীর আন্তরিক অভিলাষ কি

হতে পারে এবং মেয়েটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কতদূর গড়িয়েছে তার স্পষ্ট আন্দাজ করতে পেরে তিনি নিজেই তাদের জীবন থেকে সরে দাঁড়ানোর সংকল্প গ্রহণ করেন। অবশেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দক্ষিণাচরণকে মুক্তি দিতে সক্ষম হন এবং মৃত্যু কালে বারবারই বলতে থাকেন, "শোক করিয়ো না, ভালোই হইয়াছে, তুমি সুখী হইবে এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।" (নিশীথে, পৃ. ২২৮)

সত্যিই দক্ষিণাচরণ বাবু মনোরমাকে বিয়ে করলেন সর্বসম্মতিক্রমে। কিন্তু বিয়ের পর যখনই তিনি মনোরমার সঙ্গে মিলিত ও অন্তরঙ্গ হতে চেষ্টা করতেন তখনই তাঁর প্রথমা পত্নীর বিদেহী আত্মার উপস্থিতি অনুভব করতেন। তাঁর মনে দোষী বিবেকের (guilty conscience) বোধ জাগ্রত হত। তাই যে কোনো উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই পূর্বস্মৃতি তাঁর অবচেতন মনে জেগে উঠত এবং তিনি শিহরিত হয়ে উঠতেন। তাই জ্যোৎস্নালোকিত বকুল বেদীতে এক শরতের সন্ধ্যায় যখনই তিনি মনোরমার সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা করলেন, তখন সেই ঘনীভূত অন্ধকারে পূর্ববৎ প্রেমের অঙ্গীকার স্বরূপ মনোরমাকে বলেছিলেন, "মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনো কালে ভুলিতে পারিব না।" (নিশীথে, পৃ. ২২৯) কথাটা বলামাত্রই তাঁর মনে পড়ে গেল, একদা ঠিক একই কথা তিনি প্রথমা পত্নীকেও বলেছিলেন। তখনই তিনি চমকে উঠলেন এবং "সেই মুহূর্তেই বকুল গাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচে দিয়া, গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিমপার পর্যন্ত হাহা-হাহা-হাহা করিয়া অতি দ্রুত বেগে একটা হাসি বহিয়া গেল।" (নিশীথে, পৃ. ২২৯) সেই হাসি মর্মভেদী হাসি না অভ্রভেদী হাহাকার তা বলা যায় না, তবে এহেন ঘটনায় দক্ষিণাচরণ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে তাঁর আত্মসংবিদ ফিরে এল মনোরমার আশ্বস্তমূলক কথায়, "সে বুঝি হাসি? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ একঝাঁক পাখি উড়িয়া গেল, তাহাদেরই পাখার শব্দ শুনিয়াছিলাম" (নিশীথে, পৃ. ২২৯) - এই মর্মভেদী হাসি যে আসলে উড্ডীয়মান হংস শ্রেণির পাখার শব্দ, তা প্রকাশ্য দিবালোকে স্পষ্টাকারে বুঝতে পেরেও সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে দক্ষিণাচরণ কিন্তু সেই বিশ্বাস দীর্ঘক্ষণ স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে পারতেন না। তখন তাঁর মনে হত, "চারিদিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।" (নিশীথে, পৃ. ২২৯) অবশেষে, এমন হল যে, সন্ধ্যার পর মনোরমার সঙ্গে একটি কথাও বলা তাঁর পক্ষে সাহস হয়ে উঠল না। কিছুদিন এভাবে কাটার পর একদিন

নবদম্পতি (দক্ষিণাচরণ ও মনোরমা) পদ্মায় বোটে করে বেড়াতে যান। অর্থাৎ এরপর থেকে দক্ষিণাচরণ যেন পালিয়ে বেড়াতে চাইলেন। তাই মনোরমাকে নিয়ে বহুদূরে পদ্মাতীরে হেমন্তের (অগ্রহায়ণ মাসে) স্নিগ্ধ বাতাস লাগানোর আছিলায় ভুলতে চাইলেন অতীত এবং এমনই এক প্রাকৃতিক পটভূমিতে জ্যোৎস্নালোকিত শুভ্র সন্ধ্যায় ঘোমটা বিহীন মনোরমার রমণীয় মুখমণ্ডল দক্ষিণাচরণের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। তিনি সুদৃঢ় অলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে মনোরমাকে চুম্বন করলেন। ঠিক সেই সময়ই অলক্ষে, সেই ত্রস্ত প্রশ্ন তাদের উভয়েরই কর্ণগোচর হল, "সেই জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীর স্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল, ও কে। ও কে। ও কে।" (নিশীথে, পৃ. ২৩০) খানিক বাদেই নবদম্পতি যুক্তির নিরিখে উপলব্ধি করলেন এই শব্দ মানুষিক নয়, অমানুষিকও নয় - চরবিহারী জলচর পাখির নিরবচ্ছিন্ন ডাক বা আর্তনাদ মাত্র।

বাড়ি ফিরে এসে শ্রান্ত শরীরে মনোরমা অবিলম্বেই ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু দক্ষিণাচরণের ঘুম নেই, বিনিদ্র রজনী যাপনের নিরন্তর চেষ্টায় রত হলেন তিনি। ঠিক তখনও তিনি অনুভব করলেন, কে একজন তাঁর মশারির পাশে দাঁড়িয়ে সুষুপ্ত মনোরমার দিকে অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাঁর কানের কাছে চুপিচুপি অস্ফুট কণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করতে থাকেন 'ও কে। ও কে। ও কে গো।' (নিশীথে, পৃ. ২৩০) এহেন অবরুদ্ধ আর্তস্বর তাঁকে ভয়ভীত করে তুলল। শীঘ্রই বাতি জ্বালিয়ে ব্যাপারটা অনুধাবনের প্রয়াস করা মাত্রই ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গিয়ে তাঁর মশারি কাঁপিয়ে, বোট দুলিয়ে, তাঁর সমস্ত ঘর্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করে দিয়ে যেন হাহা-হাহা-হাহা রবে তাঁকে সচকিত করে দিয়ে একটি হাসি তিমির গহনে বিলীয়মান হয়ে গেল। অবশেষে যখন তাঁর একান্ত অসহ্য বোধ হতে লাগল, তখন তিনি ভাবলেন, আলো নিভিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত বুঝি শান্তিতে ঘুমোতে পারবেন না। কিন্তু দেখা গেল "যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে, অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল, ওকে, ওকে, ওকে গো।" (নিশীথে, পৃ. ২৩০) এমনকি তাঁর হৃদস্পন্দনে ক্রমশই ধ্বনিত হতে থাকল একই গুঞ্জরণ, একই শব্দস্পর্শ। ক্রমাগত এমন অনুভূত হল যে, সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে রক্ষিত গোলাকার ঘড়িটিও যেন সজীব হয়ে উঠল এবং তার ঘন্টার কাঁটাটি যেন মনোরমার দিকে প্রসারিত দৃষ্টিতে প্রাণবন্ত ভাবে তালে তালে বলতে লাগল "ওকে ওকে, ওকে গো। ওকে, ওকে, ওকে গো।" (নিশীথে, পৃ. ২৩০) এরই মধ্যদিয়ে গল্পের মূল কাহিনি ভাগটি পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু যেভাবে

দক্ষিণাচরণ নিজের অপরাধী মনের ভ্রান্ত ধারণাকে মনস্তাত্ত্বিক আবেগের দ্বারা ব্যক্ত করেছেন প্রভাতের আলোফোটার সঙ্গে সঙ্গেই সেই কাতরোক্তির অবসান ঘটেছে।

দক্ষিণাচরণ বাবুর মনের অবচেতন স্তরে একটি অপরাধ বোধ সুপ্ত অবস্থায় ছিল যা পরিবেশ ও পরিস্থিতি গুণে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠত। পূর্ব-পত্নীর কণ্ঠস্বর শোনার মধ্য দিয়ে তারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে তথা অতি প্রাকৃত রসোৎপাদনে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাই তিনি 'নিশীথে' গল্পটিতে এমন আশ্চর্য দক্ষতায় শুধুমাত্র বিবেকের দংশন জনিত অনুশোচনাগ্রস্ত মানুষের পরিতাপকে কেন্দ্র করে একটি ব্যঞ্জনাময় বিশ্লেষণের মাধ্যমে এমনভাবে ভৌতিক গল্প বয়ানের প্রয়াস করলেন যা শিল্প সিদ্ধিতে সার্থক। একাধারে নতুনের প্রতি আকৃষ্ট ও পুরাতনকে অস্বীকার করতে না পারার দ্বন্দ্ব দক্ষিণাচরণ বাবুর মনকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে। এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে যেভাবে রবীন্দ্রনাথ গল্পটিকে ভৌতিক পরিবেশমুখর করে তুললেন তাতে শুধুমাত্র দক্ষিণাচরণ বাবুই নন, পাঠক সমাজও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ভীত হয় ও শিহরিত হয়ে ওঠে। দাম্পত্য আদর্শচ্যুতির জন্য যে পাপবোধ, তা-ই নায়ককে মনোবিকারগ্রস্ত করে তুলেছে। এই গল্পে নায়কের মনোজগতই অতিপ্রাকৃত রসের উদ্দীপক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য শিল্প কুশলতায় এর কাহিনিকে এমনভাবে সুষমামণ্ডিত করে তুলেছেন যা পাঠকালে আমাদের মনে হয় গল্পটির ভৌতিক পরিবেশ যেন বাহ্যিকভাবেই আরোপিত, আন্তরিক অপরাধ বোধের দিকটি যেন বিশ্লেষণের অপেক্ষাধীন। তাই গল্পটি এতো সার্থক। এর প্রধান কারণ হল, গল্পটি বর্ণনা করা হয়েছে রাত্রিকালে। এমনকি, নায়ক দক্ষিণাচরণবাবু রাতের অন্ধকারেই অর্থাৎ নিশীথ কালেই প্রথমা পত্নীর অশরীরী আত্মার বিভীষিকাময় আগমন অনুভব করতেন। মৃত আত্মার আগমন রাত্রিকালেই ঘটে থাকে এ আমাদের একটি সহজাত ধারণা এবং রবীন্দ্রনাথও তা-ই দেখিয়েছেন। গল্পটির শুরু যেমন রাত্রিকালে, তেমনই রাতের অবসানেই এর কাহিনিবৃত্ত পূর্ণ হয়েছে। এক্ষেত্রে নামকরণগত সার্থকতাটিও আমাদের নজর কাড়ে। তৎসঙ্গে অতিপ্রাকৃত রসের অবতারণা ঘটাতে রাত্রিকালই যে যথোপযুক্ত ও শিল্পোপযোগী, সেই উৎকর্ষের ভিত্তিতে গল্পটিকে একটি সার্থক ও উৎকৃষ্ট অতিপ্রাকৃত বা ভৌতিক চেতনাসম্ভূত গল্প বলাই শ্রেয়।

গ্রন্থ ঋণ

আকর গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী সংস্করণ, পুনমুর্দ্রণ-বৈশাখ ১৩৯৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা-১৭

সহায়ক গ্রন্থ

১. ডঃ অশোক কুমার কুণ্ডু ও অধ্যাপক ডঃ নিশীথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) রবীন্দ্রছোটগল্প : গল্পগুচ্ছ; প্রথম প্রকাশ ১৫ নভেম্বর ২০০০, পুনমুর্দ্রণ-জুলাই ২০১২ গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা-৭০০০০৯।

২. অধ্যাপক তরুণ ঘোষ : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র ও ছোটগল্প; প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৮, সংশোধিত সংস্করণ : নভেম্বর ২০০৩, বসুশ্রী বুক স্টল, কলকাতা-৭০০০৭৩

৩. প্রদ্যোত বিশ্বাস (সম্পাদিত) : রবীন্দ্র গল্পের আকর ও আকার; প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৯, বুকস্ ওয়ে, কলকাতা-৯

৪. ববিতা কর - রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ; প্রথম প্রকাশ : রাখী পূর্ণিমা ২০১৩, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা- ৭০০০০৯।

৫. মীনাক্ষি সিংহ - গল্পগুচ্ছ ঃ জীবনের মেঘ ও রৌদ্র; প্রথম প্রকাশ : ২২ শে শ্রাবণ, ১৪১১; পুনর্মুদ্রণ - জানুয়ারি ২০১৫; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; কলকাতা - ৭০০০০৯।

৬. সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় - বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ; প্রথম প্রকাশ ২৬শে জুন ১৯৯৮ রথযাত্রা, ১১ই আষাঢ় ১৪০৫ সাল; আনন্দময়ী প্রকাশনী, হুগলী।